জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস (১৯৪৭-৭১) লিখনে মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকা: একটি বিশ্লেষণ

খান মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম*

Abstract

The purpose of this article is to analyze how Marxist philosophy can play a role in writing the history of East Bengal (1947-1971). In the discussion period,the emergence of the bourgeois class in East Bengal, has been investigated by explaining with Marx's class struggle and conflicting materialist philosophy. I have come to the conclusion that the emergence of independent Bangladesh was not based on the theory of descrimination,but due to the emergence of the bourgeois class in the above period.

চাবিশব্দ: পূর্ববঙ্গ, মার্কসীয় দর্শন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, শ্রেণি সংগ্রাম, বুর্জোয়া শ্রেণি

১

বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ, এটা জানা গেল ১৮৭২-এর জনশুমারিতে[১]। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন পূর্ববঙ্গীয়[২] মুসলিম জনগোষ্ঠী এটাতে ব্যাপক সমর্থন যুগিয়েছিল। কিন্তু বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক[৩] শ্রেণি এটার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। মূলতঃ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির বিরোধিতার কারণেই ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। মজার ব্যাপার হলো, যে ভদ্রলোক শ্রেণি ১৯০৫ সালের ভঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল তারাই দ্বিতীয়বার ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগকে সমর্থন করেছিল। বাংলা থেকেই মুসলমান জনগোষ্ঠী চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলনে সবচেয়ে সোচ্চার ভূমিকা নিয়েছিল। কেন বাংলার মুসলমানরা ব্যাপকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এ বিষয়ে ক্লাসিক গবেষণা করেছেন– তাজুল ইসলাম হাশমি।[৪] পাকিস্তান আন্দোলনের উন্মাদনা এতটাই প্রভাব বিস্তারকারী হয়েছিল যে, বাংলার মুসলমানরা হয়ে যান 'মুসলমান বাঙালি'। কিন্তু ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে 'মুসলমান বাঙালি' ধীরে ধীরে 'বাঙালি মুসলমান' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম মানসে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর উত্থান হলো, যার মাধ্যমে 'বাংলাদেশের' অভ্যুদয় হলো। বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মার্কসীয় বীক্ষা কীভাবে অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখতে পারে; সেটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে।

প্রবন্ধটিতে প্রথমে মার্কসের সামাজিক কাঠামোর পরম্পরা শ্রেণি সংগ্রাম, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের সামগ্রিক পরম্পরা আলোচনা করা হবে। মার্কসের ভারত সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত

---

* সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

করে পরিশেষে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে কেন ও কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হল, মার্কসীয় দীক্ষার সাহায্যে তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হবে।

২

মার্কস ছিলেন আধুনিক পুঁজিবাদের বিশ্লেষক। তাঁর অনুসন্ধানের মূল বিষয় ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব, তাঁর কাঠামো আর গতিবিধি। মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণি সংগ্রামকে অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে বলেছেন– আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। ... অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণি অবিরাম পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকে, অব্যাহত লড়াই চালিয়েছে কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে।[৫] মার্কস সিদ্ধান্তে আসছেন– সামন্ত সমাজের অবসানের পরও শ্রেণিবিরোধ লোপ পায়নি বরং নতুন শ্রেণি, অত্যাচারের নতুন ব্যবস্থা-নতুন রূপে ফিরে আসছে গোটা সমাজে দু'টি শ্রেণিতে–বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত-এ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মধ্যযুগের ভূমিদাসের ভিতর থেকে প্রথম শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের উদ্ভব হয়। এই নাগরিকদের মধ্য থেকে আবার বুর্জোয়া শ্রেণির প্রথম উপাদানগুলি বিকশিত হয়।[৬] প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন এবং বিনিময় পদ্ধতি ধারাবাহিকতাতেই বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[৭] উৎপাদন প্রণালী ও বিনিময় ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠলে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক কাঠামো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। বিভাজিত শ্রেণিগুলোর শ্রেণি সংগ্রামই সামাজিক কাঠামোটি ঠিক করে দেয়। সামাজিক কাঠামোটির ক্রম পরম্পরাটি এরকম— আদিম সাম্যবাদ—দাসতন্ত্র —সামন্তপ্রথা—পুঁজিবাদ—সমাজতন্ত্র।[৮] এখন প্রশ্ন হলো— অনুক্রমটি কি সার্বজনীন? সম্ভবত না। ডিডি কোসাম্বী ও রামশরণ শার্মার যুক্তিতে, দ্বিতীয় অনুক্রম 'দাসতন্ত্রে'র অস্তিত্ব ভারতে ছিলনা। হাজার খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ বা অনুরূপ কাল থেকে উপনিবেশিক শক্তির আগমন ও বিজয় পর্যন্ত নানারূপে সামন্ততন্ত্রই অধিষ্ঠিত ছিল।[৯] কারণ, সামন্তযুগের শেষদিকে বড় বণিক লগ্নিকারী বা একচেটিয়া ব্যবসার মালিকরা নতুন ভারতীয় বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত হননি। যে সামন্ততান্ত্রিক প্রাদেশিক শাসকদের ছায়ায় তারা তাদের লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল ইংরেজরা সেই শাসকদের উচ্ছেদ করে নিজেরা শাসক হওয়ার সংগে সঙ্গেই তাদেরও উপড়ে দিয়েছিল। ভারতে যারা প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সমানে সমান কারবার করে মুনাফা করেছিল, তাদের তখন ষোলকলা হয়ে গেছে, এরপর অনেকে আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বহীন জমিদারে রূপান্তরিত হতে হল। ফলে, ভারতীয় প্রাক-পুঁজিবাদী মূলধন নিজের থেকে সরাসরি যন্ত্রসভ্যতার দিকে যেতে পারেনি, ফলে অগ্রগামী সর্বহারা শ্রেণিরও বিকাশ ঘটেনি।– যেমনটা ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। যন্ত্রপাতি; কৃৎকৌশলে এবং প্রথম কৃৎকৌশলীদেরও ইংল্যান্ড থেকে আনতে হয়েছিল।[১০]

সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর পরম্পরাটি খাপ খাচ্ছে না কারণ, সামন্ত প্রথা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ পর্বে ভারতে পুঁজির বিকাশ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে হচ্ছে না। পুঁজির বিকাশের ক্ষেত্রে ইউরোপ যে সুবিধাগুলো-বাণিজ্য, লুন্ঠন, ক্রীতদাস ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-সবই জরুরি। এগুলোর অভাবে ভারত তার সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও পুঁজিবাদে উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয় মূলত ঔপনিবেশিক পুঁজির কারণে। এই ঔপনিবেশিক পুঁজির ক্ষেত্রে রেল ব্যবস্থা বাদ দিলে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির বেশির ভাগই আমদানি হয়নি। ভারতস্থিত

ইংরেজদের আনুষ্ঠানিক বেতন ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম থেকেই এই পুঁজির উৎপন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারত থেকে বৃটেনে এর স্থানান্তর পুঁজির নির্গমন।[১১]

আমরা জানি আধুনিক পুঁজিবাদ বুঝতে মার্কস ভারত সম্পর্কে বিস্তৃত নোটস নিয়েছিলেন। মার্কসের অনুসন্ধিৎসায় ছিল– ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতির সম্ভাবনা কি? কোন পথে অগ্রগতি সম্ভব? এই অনুসন্ধান কর্ম তিনি ১৮৫০ এর দশকে শুরু করেন সেটি১৮৮১-৮২ অবধি চলেছিল। চিন্তা কিন্তু এক জায়গায় থেমে থাকেনি, বরং যতই খোঁজ খবর করেছেন, ততই প্রাচ্য সমাজের বিবর্তনের স্বকীয় রূপগুলি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁর মতামতও 'মৌলিকভাবে পাল্টে' গেছে।[১২] প্রথম দিকে মার্কসের ধারণা ছিল প্রাচ্য সমাজ তথা ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তনীয়, অনড় ও স্থানুত্বে অবস্থান করছে। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে পরিবর্তনের বিপ্লবের বার্তা নিয়ে আসছে। পরবর্তী সময়ে মার্কস যতই পড়াশুনা করছেন ততই কিন্তু তার ঔপনিবেশিক শাসনের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা মুছে যাচ্ছে তাঁর চিন্তা থেকে। তিনি উপলব্ধি করছেন-ব্রিটিশ শাসন ভারতের সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তে কোনোও বৈপ্লবিক গতিশীলতার সৃষ্টি হচ্ছেনা। আধুনিক ইউরোপের পুঁজিবাদী রীতিনীতি, আইনকানুন ধ্যান-ধারণা সেখানে চাপিয়ে দিলেও দেশজ সমাজ কাঠামোও সংমিশ্রণে উদ্ভট চেহারা নিচ্ছে। ফলে ঔপনিবেশিক শোষনের চাপ বৃদ্ধি পেলেও পরিবর্তে ভারতে অগ্রসর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠছে না।[১৩]

আমরা পূর্বে যেমনটি আলোচনা করলাম, মার্কসবাদ ক্ল্যাসিক সামাজিক কাঠামোটি, যেটি ইউরোপীয় সামাজিক কাঠামোকে প্রতিনিধিত্ব করে, ঠিক ভারতের ক্ষেত্রে খাপ খায় না। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের যে বিস্তার ঘটেছিল, সেটির সুবিধা ও প্রভাব সরাসরি ভারতবর্ষে প্রতিফলিত হয়নি। কারণ, ঔপনিবেশিক পুঁজির 'নির্গমন' হয়েছিল। তাহলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস লিখন কি মার্কসীয় পদ্ধতিতে সম্ভব? এটা ঠিক যে, যেমনটি আমরা আলোচনা করলাম, ইউরোপীয় সামন্ত্রতন্ত্র ও সেটা থেকে পুঁজিবাদ উত্তরণ পর্বটি ঠিক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যায় না। সেটি মার্কস ও দেরিতে হলেও উপলব্ধি করেছেন। উত্তরণ পর্বটি ঘিরে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মৌলিক প্রভেদ থাকলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে 'মার্কসীয় পদ্ধতি' নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ সীমিত। এ সম্পর্কে সমাধান বাতলেছেন-ডিডি কোসাম্বি (২০০২)। ইতিহাস পূনর্নির্মাণে 'উৎপাদন পদ্ধতি'ও 'উৎপাদন সম্পর্ক'-এ ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক বিবরণীর উপস্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[১৪] উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন খুবই প্রাসঙ্গিক। কার্ল মার্কস তাঁর Critic of Political Economy (1859)-এর মুখবন্ধে এক অসাধারণ বক্তব্য বিবৃত করেছেন–

মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, সুনির্দিষ্ট এক আবশ্যিক সম্পর্কের জগতে প্রবেশ করে–যাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক এবং তা আবার বস্তুগত উৎপাদনী শক্তির কোন নির্দিষ্ট স্তরের বিকাশের সঙ্গেও সম্বন্ধিত। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টিই-সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে—যা আইন ও রাষ্ট্রনৈতিক উপরিসৌধের মূল ভিত্তি এবং সামাজিক-চেতনার যেকোনো রূপের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র গ্রথিত। মানুষের সামাজিক,

রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত নিমিত্তগুলির উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বের নির্ধারক নয়, বরং বিপরীতে,সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনী শক্তিগুলি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁছলে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কসমূহ বা সেগুলির অইনি অভিব্যক্তি অর্থাৎ সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ, যার মধ্যে এতদিন তারা কাটিয়েছে, সেগুলির সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। উৎপাদনী শক্তির বিকশিত রূপ যখন উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে শৃঙ্খলে পরিণত করে তখনই সূচিত হয় সামাজিক বিপ্লবের এক নবযুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র উপরিসৌধেও কমবেশি রূপান্তর ঘটে। এই ধরনের বিপ্লকে সম্যক অনুধাবনের জন্য যে পৃথকীকরণটা সবসময়ই প্রয়োজন, তা হল– উৎপাদনের অর্থনৈতিক শর্তগুলির বস্তুগত আমূল পরিবর্তন— যা বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুলতায় নিরূপণ করা যায়; এবং আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক— বা এককথায় ভাবাদর্শগত রূপ, যার মধ্য দিয়ে মানুষ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ও দ্বন্দ্বের বিলোপ ঘটাতে চায়। উৎপাদনী শক্তিগুলির যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হবার সুযোগ আছে তেমন কোন সমাজ ব্যবস্থা কখনই হঠাৎ বিলুপ্ত হতে পারে না এবং নতুন উন্নত উৎপাদন সম্পর্কগুলিও কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের রূপ পরিগ্রহের বস্তুগত শর্তগুলি পুরনো সমাজের গর্ভে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই মানুষ চিরকাল সেই সমস্যাগুলিরই সমাধান করতে এগোয়— যা তারা পারে; আরো তলিয়ে দেখলে, সর্বক্ষেত্রেই সমস্যাগুলি তখনই জেগে ওঠে যখন সেগুলি সমাধানের বস্তুগত শর্তগুলি ইতিমধ্যেই অস্তিত্ব পেয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে অস্তিত্ব পেতে চলেছে। একটি বৃহত্তর রূপরেখায় এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন রীতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতি অভিমুখীন এক একটি যুগারম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মার্কসের উপরিউক্ত বক্তব্যের সার্বজনীন ব্যাঞ্জনা রয়েছে। এটিকে পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস লিখনে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের স্বাভাবিক সতর্কতা জরুরি। শ্রেণি দ্বন্দ্বের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখেই ইরফান হাবিব দুটি মৌলিক দ্বন্দ্বের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন–

প্রথমত: কায়িক ও মানসিক শ্রম এর দ্বন্দ্ব: আমলা কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি শ্রেণির উচ্চতর বেতন ও কর্তৃত্ব অনিবার্যভাবে একটি দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়, যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে উচ্চতর উৎপাদনের স্বার্থে সমাজতন্ত্রে এই শ্রেণিগুলিকে বহাল রাখতে হয়।

দ্বিতীয়ত: গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব: কৃষির ওপর শিল্পের প্রাধান্যরূপে সমাজতান্ত্রিক দেশে এ দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সামাজিক আদিম সঞ্চয়ের তত্ত্বটি কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হলেও শিল্পায়নে উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রায়শই এটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৫] ইরফান হাবিব যে দ্বন্দ্বের কথা উপস্থাপন করেছেন; সেটি অবশ্যই সার্বজনীন নয়। এটি তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করছেন। তাহলেও 'শ্রেণি দ্বন্দ্ব'– অবশ্যই সার্বজনীন; এটির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারীর অভাবে হবে, সেটা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাইরে, বিশেষত, যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশের ব্যাপারেই আমরা নিশ্চিত নই, সেখানে মার্কসীয় দর্শনে ইতিহাস লিখন নিঃসন্দেহে সরল নয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে নতুন একটি পথরেখা গড়ে পিটে নিতে হবে।

৩

১৯৪৭-৭১ কালপর্বে পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস পাঠে গভীর মনোযোগ ও সতর্কতা জরুরি। ঐ পূর্ববঙ্গীয় জনগণ ঔপনিবেসিক শক্তির বিরুদ্ধে চল্লিশের দশকে 'পাকিস্তান আন্দোলন' করেছিল। এরাই আবার বিশেষ করে ৬০,র দশকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। বাংলাদেশের উত্থানকে প্রায়শই ব্যাখ্যা করা হয়-দুই পাকিস্তানের মধ্যে 'বৈষম্যতত্ত্ব' দিয়ে।[১৬] এই বৈষম্যতত্ত্ব দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যূদয়কে ব্যাখ্যা করাটা সম্ভবত খুবই অগভীর। পাকিস্তান সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬৫-১৯৭০) বৈষম্য কমে আসছিল। আর পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭০-৭৫) দেখা যায় পূর্ব পাকিস্থানের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে ৬০% আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ৪০%। টাকার অঙ্কে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ২৯,৪০০ মিলিয়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বরাদ্দ ১৯৬০০ মিলিয়ন।[১৭] তাছাড়া, যে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 'উন্নয়ন' সমভাবে হয় না। উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ছাড়াও অবকাঠামোসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয়াদির উপস্থিতি অত্যাবশ্যক, উদাহরণ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 'উন্নয়ন বা উন্নয়ন বাজেটে'র তারতম্য বিরাজমান সত্ত্বেও 'বৈষম্যতত্ত্ব' দিয়ে কেউ স্বাধীন হয়ে যায়নি। তাই 'বৈষম্যতত্ত্ব' পূর্ববঙ্গীয় জনগণের উত্থানের পুরো গল্পটির প্রতিনিধিত্ব করে না। এর জন্য একটু গভীরে অনুসন্ধান চালানো সমীচীন হবে।

প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া যাক ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ে ঔপনিবেশ বিরোধী পাকিস্তান আন্দোলন পর্বে। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান আন্দোলন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি আর্থ-সামাজিক উপাদান দ্বারা সঞ্চারিত ছিল। জমিদারের প্রভাব এসব জেলায় সমান ছিল না। ছোট জমিদার বা জোতদার প্রভাবিত জেলা ছিল রংপুর ও দিনাজপুর। আবার মুসলিম মধ্যবিত্ত কৃষকদের প্রভাব ছিল নোয়াখালী কুমিল্লায়। নোয়াখালী এবং কুমিল্লায় ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন বেশি ছিল তার কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লিগে যোগ দিলে নোয়াখালী ও কুমিল্লায় মুসলিম লিগের জনসমর্থন বেড়ে যায়।[১৮]সাধারণ মুসলমান জনগণের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং জমিদারী ও মহাজনি প্রথার বিলোপের দাবীর বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরোধিতাই দেশভাগের পথরেখা তৈরি করেছিল। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে স্বরণে রাখা দরকার, মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টি জমিদারি প্রথা বিলোপে বেশি সোচ্চার ছিল।[১৯]

এপ্রসঙ্গে আর আলোচনা না বাড়িয়ে মোদ্দা কথায় বলা যায়-পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকরা দলে দলে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই জন্য যে, 'পাকিস্তান' অর্জন তাদের হিন্দু 'জমিদার' ও 'মহাজন' শ্রেণি থেকে মুক্তি দেবে।[২০] কিন্তু 'পাকিস্তান' অর্জনের পর দেখা গেল হিন্দু জমিদার, ভদ্রলোক ও মহাজনদের মূলে মুসলিম কৃষকদের নেতৃত্বদানকারী আশরাফ, উলামা ও জোতদার শ্রেণিটি সেই স্থান দখল করেছে।[২১]

এবার, পূর্ববঙ্গীয় জনগণের 'পাকিস্তান' হাসিলের সময়কালীন সময়ে দৃষ্টি দেয়া যাক- পূর্ব ও পশ্চিম নামে যে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের পথ চলা আরম্ভ হলো, সেটা কোনোভাবেই ভারসাম্যপূর্ণ ছিলনা। পশ্চিম পাকিস্তান বেশি সম্পদশালি ছিল, কারণগুলো হলো-প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ছিল এক্ষেত্রে। পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনের দিক দিয়ে বৃহত্তম-৩১০,০০০ বর্গমাইল পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৫০০০ বর্গ মাইল। আবার জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে পূর্ব

পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% লোকের বসবাস। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি সম্পদশালী। ব্রিটিশদের তৈরি করা আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ছিল পাকিস্তানে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত ছিল-নগরায়ন ও শিল্পোায়নের ক্ষেত্রে। এছাড়াও বড় ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, শিল্পপতি, ভূস্বামী, ধনী কৃষক এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা, ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক ডজন ভালো মানের কলেজ যা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল।[২২] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আইসিএস অফিসার ছিল ৯৫ জন আর পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ০১ জন।[২৩] করাচিতে ছিল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সমুদ্রবন্দর, পূর্ব পাকিস্তানে বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ছিল না।[২৪] ১৯৪৭-৫০ কালপর্বে প্রায় সব হিন্দু পেশাজীবী, শিক্ষক, অভিজাত হিন্দুরা ভারতে চলে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দুদের মধ্যে মাত্র ৪% ছিল কৃষক, ৩৮% ছিল ব্যবসায়ি ও শিল্পোপতি, ১২% চিকিৎসক, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষিত পেশাজীবী।[২৫]দেশভাগের পরিণতিতে হিন্দু পেশাজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতির দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলমান প্রশাসক, শিক্ষক ও পেশাজীবীদের দিয়ে। অনেক মুসলমান কলেজ শিক্ষক একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। আবার, পূর্ব পাকিস্তানের শূন্যতা পূরণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অপেক্ষাকৃত গোছালো ও দক্ষ পেশাজীবীর এগিয়ে এলেন। উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ভারসাম্যহীনতায় ভারতে হিন্দু পেশাজীবীদের দেশত্যাগে সৃষ্ট শূন্যস্থান পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ পেশাজীবী বুর্জোয়া শ্রেণিটি সেই জায়গা নিচ্ছে। এবার আমরা অভিবাসি মুসলমানদের দিকে দৃষ্টি দেই। অভিবাসী মুসলিমদের মধ্যে-উত্তর ভারতের উর্দুভাষী শিক্ষিত ব্যবসায়ী শ্রেণিটি পশ্চিম পাকিস্তানে যায়, আর পূর্ব পাকিস্তানে আসে কম শিক্ষিত দরিদ্র মুসলিমরা, যারা মূলত বিহার ও পশ্চিম বাংলা থেকে আগত।[২৬] পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুভাষী মোহাজের মুসলিমরা পুঁজি বিনিয়োগ করল।[২৭] এই পুঁজির সাথে পরবর্তী কালে মেট্রোপলিটন পুঁজির সংযোগ ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানে বুর্জোয়াদের হাত ধরে প্রাথমিকভাবে এভাবে পুঁজির বিকাশ হয়।

১৯৪৭ সালে যে 'পূর্ববঙ্গীয় সমাজটি' পূর্ব পাকিস্তান হলো সেটি বিভাগপর্বে বাংলায় ছিল প্রধানত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্জল উদাহরণ 'পাট'। পূর্ব বঙ্গে পৃথিবীর ৮০% পাট উৎপাদিত হলেও এ অঞ্চলে কোনো পাটকল ছিল না। পাটকলগুলো ছিল কলকাতা ও তৎসন্নিহিত এলাকায়। দেশভাগের ফলে পূর্ব বঙ্গীয় পাটের তাৎক্ষনিক গন্তব্যস্থল হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, কারণ পূর্ববঙ্গে পাটকল স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালে নারায়ণগঞ্জে।[২৮]

এবার ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে সংস্কৃতির জগতে পরিবর্তনকারী ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেই। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৮ এ ভাষার প্রশ্নে জিন্নাহর বক্তব্যে তাৎক্ষনিক ও প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ছাত্র-ছাত্রী কারা? এরা তারাই ঔপনিবেশিক আমলে হিন্দুদের থেকে চাকুরী, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশায় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ভয়ে থাকত। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়েও ভাষার প্রশ্নে অন্যভাষার (উর্দু) আধিপত্যে পিছিয়ে পড়ার শঙ্কাতেই সেই শ্রেণিটি প্রতিবাদ করল। এই শ্রেণিটিই ঔপনিবেশিক আমলে 'পাকিস্তানে'র স্বপ্ন দেখেছিল মূলত হিন্দু জমিদার, ভদ্রলোক ও মহাজনদের থেকে মুক্তি'র। ভাষা'র প্রশ্নটি সামনে আসাতে গোটা চল্লিশের দশকে, পাকিস্তানআন্দোলনের জোয়ার ভাসতে থাকা পূর্ববঙ্গের 'মুসলমান বাঙালি'র পরিচয় বাঙালি

মুসলমান পরিচয়নকালের সূচনা বিন্দু সৃষ্টি করল। বদরউদ্দিন উমর সেটাকে বলছেন-বাঙালি মুসলমানদের 'ঘরে ফেরা'।[২৯] 'মুসলিম বাঙালি'র এই 'বাঙালি মুসলমান' হওয়া দীর্ঘ মেয়াদে গোটা পূর্ববঙ্গকে প্রভাবিত করেছিল। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের সঙ্গে সংখ্যগুরু ভাষাভাষীদের 'শ্রেণি সংঘাতে'ই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে'র উত্থান। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে 'ভাষা প্রশ্নে' বাঙালি মুসলমানের সরব প্রতিবাদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। উদীয়মান শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শেণির শ্রেণি চেতনার সেই শুরু। এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিকট মুসলিম লিগের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে 'মুসলিম' রাজনীতির 'শেষের শুরু' বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার প্রথম দশকে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 'ভার্নাকুলার এলিটে'র উত্থান। বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক যুগে প্রবেশের ঘটনাটি ঘটে একটু দেরিতে। স্বাধীনতার পূর্বে বাঙালি মুসলমানদের যারা নেতৃত্ব দিত, তারা ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক অবাঙালি (ননভার্ণাকুলার)। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রথম দশকেই ভার্নাকুলার এলিটরা ভাষাকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক দল ও প্লাটফরম গঠন করে। ১৯৫৪ এর নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে ভার্ণাকুলার এলিটরা পুরাতন অবাঙালি অভিজাত শ্রেণিকে ক্ষমতার রাজনীতিতে হারিয়ে দেন।[৩০]আওয়ামী লিগ 'আওয়ামী মুসলিম লিগ' থেকে 'মুসলিম' বাদ দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা করে ১৯৫৬ সালে। এর মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের সেক্যুলার রাজনীতির সূচনা হয়।

স্বাধীনতার প্রথম দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ছাড়াও আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো-বাঙালি ও অবাঙালি দ্বন্দ্ব। আমরা পূর্বে আলোচনায় দেখিয়েছিলাম, হিন্দু ভদ্রলোক, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করে অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারতীয় অভিবাসি মুসলিমরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমান শ্রেণি এটাকে দেখল বৈষম্য হিসেবে। তারা দেখল নবসৃষ্ট কলকারখানার মালিকানায় অবাঙালি, এই অবাঙালি শিল্পমালিকরা অবাঙালি শ্রমিকদের কারখানায় চাকুরি দিচ্ছে। এতে বঞ্চিতের ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। 'বাঙালি ও 'অবাঙালি' যথাক্রমে 'আমরা ও 'তারা' হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই বাঙালি ও অবাঙালি দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে পঞ্চাশের দশকে মাঝামাঝি সময়ে আদমজি পাটকল বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গায় কয়েকশত শ্রমিক নিহত হয়। পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান শাসনের 'শেষের শুরু' তখনই।[৩১]

এবার আসা যাক, ষাটের দশকে। এটা স্বীকৃত যে, পূর্ব বাংলার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশক ছিল 'স্থবিরতার পর্ব'।[৩২] ষাটের দশকে এই স্থবিরতায় গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯-৬৫ কালপর্বে মাথাপিছু আয় বেড়ে হয় ২.৬%। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৪৮ মাইল রাস্তা তৈরি হয়, ১৯২৯ জন নূতন ডাক্তার যেমন তৈরি হয় তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে ১১৫৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়। হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৪১৯০০১,৮১১০৩ এবং ৫০৬৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।[৩৩] যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে পূর্ববঙ্গীয় কৃষকরা তাদের পণ্য সামগ্রী পরিবহণে অভূতপূর্ব সুবিধা পায়। এর প্রত্যক্ষ ফল হলো- কৃষকের হাতে নগদ টাকার প্রবাহ। এই কৃষকের সন্তানরাই ষাটের দশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করছে। ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়ে যাওয়া এই শিক্ষার্থীরাই সেই শ্রেণির জন্ম দিল, যে শ্রেণি হলো 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি'।

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা রেখেছিল।

৪

এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আমরা পূর্ববঙ্গীয় জনগণের 'বাংলাদেশ' হাসিলের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছি মাত্র। এই ব্যাখ্যা উপস্থাপনে প্রথমেই আমরা 'বৈষম্যতত্ত্ব'কে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছি; সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের কোন শ্রেণিটি 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের শ্রেণি কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল? শ্রেণি কাঠামোর কোন দ্বন্দ্বগুলো রাষ্ট্রকে পরিচালিত করেছিল; সে এই প্রশ্নগুলো তুলতেই হবে। কারণ, প্রামান্য নথিগুলো একমাত্র সঠিকভাবে প্রশ্ন করলে তবেই সাড়া দেয়।[৩৪]সামাজিক কাঠামোর পরম্পরা, শ্রেণিসংগ্রাম, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন উত্থাপন করতেই হবে। মার্কসই বলেছেন– আমাদের সমকালীনদের নিশ্চিতভাবেই একটি কাজই করা উচিত, সেটা হলো– বিদ্যমান সবকিছুর আপোষহীন সমালোচনা। এক্ষেত্রে ইএইচ কারের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ– ঐতিহাসিকের কাজই হলো শুধু কী হয়েছিল, আর কেন হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়া।[৩৫] বুর্জোয়া শেণির অনুপস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শক্তির অবসানের পরও ১৯৪৭ পূর্ববঙ্গীয় জনগণের মুক্তি মেলেনি। অপেক্ষাকৃত গোছালো ও দক্ষ বুর্জোয়া শ্রেণি থাকায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আধিপত্য করেছে এবং প্রথমে প্রান্তস্ত পুঁজি পরে মেট্রোপলিটন পুঁজি উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কে নির্ধারণ করেছে। পুঁজির প্রবাহেই পূর্ব পাকিস্তানেও বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ঘটে গোটা ৬০-র দশক জুড়ে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে মৃদুতালে, ৫০র দশকে অনেকটা নীরবে, আবার ৬০-র দশকে পূর্ববঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণির সরব উত্থানই 'বাংলাদেশ' এর অভ্যুদয়ে ভূমিকা রেখেছিল। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতাতেই পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস লিখন সম্পূর্ণ ও যৌক্তিক হতে পারে। আর পর্যালোচনার তাত্ত্বিক ভিত্তিটা হবে মার্কসবাদী।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh* (Dhaka: The University Press Limited-2009), P. 84.

২ ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব বঙ্গ 'পাকিস্তানে' পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে ১৯৫৬ সাল থেকে পরিচিতি পায়। এই পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তানই ১৯৭১ সালের 'বাংলাদেশ'।

৩ ভদ্রলোক কারা? ...তারা ছিল খাজনা আদায়কারী শ্রেণির প্রতিরূপ; জমির পত্তনি স্বত্ব দেওয়া অধিকার ভোগকারী। ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য ছিল, ভূমির পরিমাণ, আকার, উর্বরতার পার্থক্য এবং উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পাওয়া শর্তাধীন জমির অভিন্ন শর্তে অধস্তনদের কাছে লিজ দেওয়া ও মধ্যবর্তী স্বত্ব ভাগাভাগির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ... তারা জমিতে কাজ করত না; জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা দিয়েই তারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। ভদ্রলোক হলো দেশের অনুভূতিহীন মাটির সন্তানদের ঠিক বিপরীত, কায়িক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকাকে এই 'বাবু' শ্রেণির লোকেরা নিজেদের ও সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্বের জন্য অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচনা করত। ... মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য দেখুন– জয়া চ্যাটাজী, *বাঙলা ভাগ হলো* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ২০০২), পৃ. ৩-১২।

৪ দেখুন,Tajul Islam Hasmi,*Peasant UtopiaThe Communalization of Class Politics In East Bengal, 1920-1947*, 1994)

৫ মার্কস ও এঙ্গেলস, *কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার* (কলকতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট, লিমিটেড- ২০১৮), পৃ. ২৭।

৬ মার্কস ও এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৭ মার্কস ও এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৮ আব্দুল হালিম, *নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস* (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ৩৮।

৯ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে* (কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০২), পৃ. ৫।

১০ দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি,*ভারতবর্ষের ইতিহাসর চর্চার ভূমিকা* (কলকাতাঃ কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, ২০০২), পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

১১ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে*, পৃ. :৯।

১২ পার্থ চট্টেপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. ১০১।

১৩ পার্থ চট্টেপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

১৪ ডিডি কোসাম্বি, *ভারতবর্ষের ইতিহাসর চর্চার ভূমিকা*, পৃ. ১-১৪।

১৫ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে*, পৃ. ১১।

১৬ দেখুন, Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration* (Dhaka: University press limited, 1994).

১৭ G.W. Choudhury, *The Last Days of United Pakistan* (Dhaka: University Press, ***1994), pp. 62-63.***

১৮ Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021Crises of Culture, Development, Governance and Identity,* (Palgrave macmillan, 2022), p. 49.

১৯ দেখুন, Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021Crises of Culture, Development, Governance and Identity,* p. 50.

২০ Tajul Islam Hashmi, *Preasant Utopia; Communalization of class politis in East Bengal, 1920-47,* pp. 248-256.

২১ দেখুন, Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021Crises of Culture, Development, Governance and Identity,* p. 50.

২২ দেখুন, Taj Hashmi, Ibid, p. 50.

২৩ Taj Hashmi, Ibid, p. 66.

২৪ Taj Hashmi, Ibid, p. 53.

২৫ Sirajul Islam (Ed.), 1997, *History of Bangladesh Vol. 1,* (Dhaka: Asiatic society of Bangladesh, 1997), p. 116.

২৬ পশ্চিম বাংলা থেকে আগত মুসলিম অভিবাসিরা খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোরে রিফুইজি মুসলিম হিসেবে হিসেবে স্থানীয়ভাবে পরিচিত।

২৭ Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration,* pp. 31-32.

২৮ Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021Crises of Culture, Development, Governance and Identity,* p. 53.

২৯ বদরউদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়িকতা* (ঢাকা: গ্রন্থনা, ১৯৬৯), পৃ. ৮-১১।

৩০ Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration,* pp. 38-39.

৩১ Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021Crises of Culture, Development, Governance and Identity,* p. 63.

৩২ Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration,* p. 30.

৩৩ Rounaq Jahan, Ibid, PP. 81-82.

৩৪ Marc Bloch, *The Historian's Craft,* (Manchester University Press, 1965), p.64.

৩৫ ই.এইচ কার, *কাকে বলে ইতিহাস* (কলকাতা: কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানী, ২০০৬), পৃ. ৮১।

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ১০.১২.২০২২